২. মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে অখণ্ড ভারতের পরিবর্তে উত্তর ভারতে ষোড়শ মহাজনপদ বা ষোলটি ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল। এগুলির অধিকাংশই ছিল রাজতন্ত্রশাসিত, কিছু ছিল প্রজাতন্ত্র। মহাজনপদগুলির রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল ছিল প্রধানত গাঙ্গেয় উপত্যকা। শেষ পর্যন্ত মগধ তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করে ভারতীয় ইতিহাসে প্রথম সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মগধের উত্থানকে প্রাক্ নরম্যান যুগে ওয়েসেক্সের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ও আধুনিক ইওরোপে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানির অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মগধের উত্থানের ইতিবৃত্ত বিম্বিসার থেকে শুরু, অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ে সমাপ্তি। এই উত্থানের পেছনে রাজবংশ বা ব্যক্তিবিশেষের অবদান যেমন ছিল, তেমনই ছিল ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকা। বৈদিক সাহিত্য থেকে সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায় না। বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায় ও জৈন ভাগবতী সূত্রের সাহায্যে মগধের উত্থানের ইতিহাস আমাদের জানতে হয়।

(ক) রাজবংশ ও ব্যক্তি ঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে মগধের প্রতিটি রাজবংশ সুদক্ষভাবে সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করায় মগধের রাজ্যবিস্তার অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। হর্যঙ্ক, শিশুনাগ, নন্দ, সর্বোপরি মৌর্যবংশ, সব শাসনেই বিস্তারনীতি অব্যাহত থাকে। একই বিদেশনীতি দীর্ঘকাল অনুসৃত হতে থাকায় মগধের অভ্যুত্থান সহজ হয়েছিল। সমগ্র উত্থান-পর্বে মগধের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন সুদক্ষ নৃপতিবৃন্দ। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, মহাপদ্মনন্দ এবং পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের মত প্রতিভাবান নৃপতি মগধের নিরবচ্ছিন্ন উত্থানকে সুনিশ্চিত করেন। কোন রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে যোগ্যতর রাজবংশ শাসনক্ষমতা দখল করেছে। মগধের রাজারা সবসময় সুযোগ্য মন্ত্রী ও কূটনীতিজ্ঞের পরামর্শ লাভ করেছেন। অজাতশত্রুর মন্ত্রী বাস্সাকর, চন্দ্রগুপ্তের কৌটিল্য বা চাণক্য ও অশোকের রাধাগুপ্তের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(খ) ভৌগোলিক ঃ ভৌগোলিক অবস্থান মগধের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। গঙ্গা, শোন ও গণ্ডক নদী তিনদিক থেকে মগধকে বেষ্টন করে রাখায় বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা ছিল কম। পাঁচটি পাহাড় ও উচু প্রাচীর বেষ্টিত রাজধানী রাজগৃহ ছিল আরও নিরাপদ। গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পরবর্তী রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার ওপর মগধের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা সহজ হয়।

(গ) জনসংখ্যা ঃ মগধের বিশাল জনসংখ্যা ছিল তার শক্তির অন্যতম উৎস। জনসংখ্যার এক বড় অংশ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে অরণ্যভূমি পরিষ্কার করে ব্যাপকহারে কৃষিকার্যে লিপ্ত হয়। জনসংখ্যার একাংশ বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। অপর এক অংশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। উপজাতীয় সেনার স্থলে এখন স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রে সেনানায়কের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় নন্দ-রাজদের কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, দু'লক্ষ পদাতিক, দু'হাজার রথ এবং তিন থেকে ছ' হাজার হাতি ছিল। লৌহ ও তাম্রখনির ওপর অধিকার থাকায় নতুন অস্ত্র নির্মাণ সম্ভব হয়।

(ঘ) কৃষি ও খনিজ সম্পদ ঃ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মগধ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিভূমি রচনা করে। কৃষিকার্য এবং লৌহ ও তাম্র খনিগুলিকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব মগধের ছিল না। জনসংখ্যার এক বড় অংশ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের অরণ্যভূমি পরিষ্কার করে ব্যাপকহারে কৃষিকার্যে লিপ্ত হয়। পলিমাটির আধিক্যের জন্য মগধের জমি ছিল উর্বর। ফসল ফলত নানা রকম ও তা দু'বার ফলত। রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন, কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে একটি সাম্রাজ্যিক কাঠামো গঠনের সম্ভাবনা মগধেই প্রথম জন্ম নেয়। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা দেখিয়েছেন মগধের জমি উর্বর হওয়ায় এক সম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যারা বলি, ভাগ ও কর রূপে রাষ্ট্রকে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করতে থাকে। মগধের সমৃদ্ধির অপর উৎস তার খনিজ সম্পদ। আলোচ্য সময়ে দৈনন্দিন জীবনে ও অস্ত্র নির্মাণে লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। লোহার ফাল ব্যবহারের ফলে কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। এই সময় গয়ার কাছে বারবর পাহাড় ও ধারওয়ারে লৌহখনি আবিষ্কৃত হয়। লৌহ ও তাম্র সম্পদে ধলভূম ও সিংভূম ছিল ভারতশ্রেষ্ঠ। কৌটিল্য যথার্থই লিখেছিলেন, রাজকোষ খনির ওপর নির্ভর করে এবং সেনাবাহিনী রাজকোষের ওপর। খনি সম্পদই হচ্ছে যুদ্ধসামগ্রীর গর্ভাশয়। অতএব কৃষি, অরণ্য, খনিজ ও সর্বোপরি জনবল মগধকে শক্তিশালী করে তোলে।

(ঙ) নৌবাণিজ্য ঃ রোমিলা থাপার মগধের উত্থানের পেছনে বাণিজ্যের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মগধের অবস্থান নৌবাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল। গঙ্গার এক বড় অংশ মগধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় পূর্বভারত থেকে বারাণসী পর্যন্ত এই জলপথেই পণ্যসামগ্রী চলাচল করত। প্রতিবেশী অঙ্গ রাজ্য অধিকারের পর চম্পা বন্দর মগধের অধীনে আসে। দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য এই বন্দরের মাধ্যমেই চলত। লিচ্ছবিদের পরাস্ত করে মগধ বৈশালীসহ গঙ্গার দুই উপকূল দখল করে নিলে নৌবাণিজ্যের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ আরও বৃদ্ধি পায়।

(চ) আর্য-অনার্য সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঃ মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত হওয়ায় মগধের সংস্কৃতিতে একদিকে পাঞ্জাবকেন্দ্রিক আর্য সংস্কৃতি অন্যদিকে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। উত্তরভারতের আর্যসংস্কৃতির প্রবাহ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব পার হয়ে যখন মগধে পৌঁছায় তখন তার তথাকথিত শুদ্ধতা ও উগ্রতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম-প্রসূত সামাজিক বিধিনিষেধের বন্ধন এখানে শিথিল ছিল। অপরদিকে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকাস্থিত অনার্য সভ্যতার রেশ তখনও মগধে ছিল। উভয় সংস্কৃতির

মিলনে মগধ নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। পূর্বভারত থেকেই মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের ধর্মবিজয়যাত্রা মগধের উত্থানকে আরও গতিশীল করে।

(ছ) আদর্শগত প্রেরণা ঃ মগধের উত্থানের পেছনে এক আদর্শগত প্রেরণা কাজ করেছিল বলে অনেকে মনে করেন। প্রাচীন ভারতে দুটি বিপরীতমুখী চিন্তাধারার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রাচীন গ্রীসের মত আঞ্চলিক স্বাধীনতার চিন্তা, অপরটি সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার আদর্শ, যার অস্তিত্ব প্রাচীন গ্রীসে নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মহাপুরুষের জন্য আকাঙ্ক্ষা। ধর্মের ক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উন্মেষকে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মগধের উত্থানকে সম্ভব করেছিল।

(জ) উচ্চবর্ণ ভিত্তিক সংগঠন ঃ বৈদিক যুগের সমতাবাদী উপজাতীয় আইনবিধির স্থলে নতুন বর্ণভিত্তিক আইন ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় কেমন করে শক্তিশালী অঞ্চলগত রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটল তা ব্যাখ্যা করেছেন দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা। বৈদিক যুগের শেষদিকে সভা ও সমিতির মত উপজাতীয় গণসভাগুলি তাদের গুরুত্ব হারায়। বৃহদায়তন অঞ্চলগত রাষ্ট্রের কাঠামোয় এই সভাগুলির স্থান নেয় উচ্চবর্ণভিত্তিক সংগঠন যারা অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকেসমর্থন করে। ধর্মশাস্ত্রগুলি রাজচক্রবর্তী, একরাট, বিরাট, সম্রাট প্রভৃতি উপাধির মাধ্যমে বহুধা বিভক্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানায়। মগধের শক্তিশালী রাজতন্ত্র এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।